বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ঃ 'আরেক মুঠো অথৈ আকাশ'

প্রীতম চক্রবর্ত্তী
অতিথি অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

[বিষয় চুম্বকঃ বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে যে কজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। মেধাবী এই কবির কাব্যচর্চার প্রধান বৈশিষ্টই হল বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন ভঙ্গির বৈচিত্র্য। একজন নারী হিসাবে নারীর মনন-চিন্তন নিয়েই মরমী কলমে রচনা করেছেন কবিতা। কখনোই তিনি ঘোষিত নারীবাদী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেননি। উচ্চকিত প্রতিবাদে বিশ্বাসও করতেন না। অথচ সেই মৃদু প্রতিবাদও কোনো কোনো সময় তীব্র ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। কেবল মেয়েদের যন্ত্রণা, সমস্যা বা সে-সব বিষয়কে নিয়েই নিজের কাব্যচর্চাকে কেন্দ্রীভূত রাখেননি, সমকালীন নগ্ন ও আদর্শহীন রাজনীতি, ভোগবাদের প্রাচুর্য কবিকে যন্ত্রণায় কাতর করেছে। নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব, তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা, প্রযুক্তির অমানবিক ব্যবহার প্রভৃতির কথা যেমন তাঁর কবিতায় আছে, তেমনই নিপুন হাতে নিটোল প্রেমের কবিতাও রচনা করেছেন কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়]

বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *'আমার প্রভুর জন্য'* প্রকাশিত হয় ১৯৬৭তে। সেদিক থেকে তিনি ষাটের দশকের কবি। কৃত্তিবাস পত্রিকার অন্যতম কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সহধর্মিনীও বটে। ১৯৬৩তে তাঁর লেখা কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। ১৯৬৪ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত থেকেছেন লেখালিখিতে। এর পাশাপাশি এই মেধাবী কবি ছিলেন আর এস এম বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। বর্তমানে যুক্ত আছেন The Dept. of Indological Studies & Research, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা নিকেতনের সঙ্গে। বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকেও নিভৃতে নিজের কবিতাচর্চা অব্যাহত রেখেছেন কবি। বাংলা ছাড়াও তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষাতেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রথম কাব্য প্রকাশের পর আর কলম থামেনি, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়ে চলেছে তাঁর একের পর এক কাব্যগ্রন্থ, - *'যদি শর্তহীন', 'ভেঙ্গে যায় অনন্ত বাদাম', 'উড়ন্ত নামাবলী', 'দাঁড়াও তর্জনী', 'অশ্লেষা তিথির কন্যা'* প্রভৃতি। সর্বশেষ প্রকাশ পেয়েছে 'আজন্ম হস্টেলে আছি' কাব্যটি। 'এসো আমরা নাটক কবি', 'মাঝখানের দরজা' প্রভৃতি তাঁর অন্যতম গদ্যগ্রন্থ। ইংরেজী ভাষায় লিখেছেন, 'No Symbol No Prayer', 'Shadow in the Seed' প্রভৃতি বইগুলি।

বিজয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতা সংগ্রহ'-এর প্রাক কথনে লিখেছিলেন -

''পরিণত বয়সে পৌঁছে পিছন ফিরে দেখেছি জীবনটা সুখে দুঃখে, বেদনা ও অহংকারে মিলে

মিশে অন্য অনেকের থেকে ভালো কেটেছে। ১৯৬৪ সাল থেকে নির্দিষ্ট লেখালেখি শুরু, আজ অবধি ১৬টি বইও প্রকাশিত হয়ে গেছে। তার অধিকাংশই কবিতা। আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপন, লিখনশৈলীর বিবর্তন ও উত্তরণ ভাষা ব্যবহারের অন্তহীন পরীক্ষা - এসব কবিতায়ই সম্ভব বলে আমি মনে করি।"

কবি শুধু মনে করে ক্ষান্ত হননি, সেই সম্ভাব্যতাকে নিজ কাব্যচর্চায় মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই কবির প্রভু হয়ে উঠেছেন কবিতা। 'আমার প্রভুর জন্য' কবিতায় লিখেছেন—

হে জ্ঞানী পিতৃকুল
তোমাদের আভূমি প্রণাম
কন্যাকে ত্যাগ করো অন্ধকারে।
তোমাদের ঘৃণাঞ্জন আমার অঙ্গলেপ, বিস্মৃত তমস্বান উত্তরীয়
ধিক্কারে রাত্রিস্তোম সংকলিত হোক।

বিষয় বৈচিত্রে ভরা তাঁর কবিতার ভুবন। একই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন কবিতায় ঘটেছে বৈচিত্রের সমাহার। বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা রচনার কালের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে ১৯৬৩তে কৃত্তিবাস পত্রিকার ষোড়শ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হাংরি আন্দোলন ক্রমশ বিশাল আকার ধারণ করেছে। বাংলা কবিতায় শ্রুতি আন্দোলনের শুরু। অশ্লীল কবিতা লেখার দায়ে জেল হয় মলয় রায়চৌধুরীর। এরই মাঝে রাজনৈতিক সংকট, - ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গন, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন, সমগ্র রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং সর্বোপরি নকশাল আন্দোলন সমগ্র বাংলাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার দাবীতে ব্যাপক আন্দোলন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে বাংলাদেশের জন্ম হয়। কবি নিজেও জন্মেছিলেন ১৯৩৭এ, ঢাকার বিক্রমপুরে। ১৯৪৭এর দেশভাগের যন্ত্রণাও কবির রচনার এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। উত্তাল সেই সময়ের কলরব খুব উচ্চকিত না হলেও স্পষ্ট শোনা গেছে বিজয়া মুখোপাধ্যায় কবিতায়—

ভোর হলে রক্তপাত থামাবার বন্দোবস্ত হবে
তাঁর আগে সামনে এস, বেজেছে সাইরেন
নারকেল পাতার ফাঁকে নক্ষত্ররা সজ্জিত হয়েছে
নিঃশব্দ উপনিবেশ, যাও
সাজো। (বেজেছে সাইরেন)

'নৃশংসতা তুমি' কবিতাতেও ফুঠে উঠেছে এই চিত্র। কবিতা শুরু করেছেন শ্লেষের মধ্য দিয়ে - 'নৃশংসতা, বন্দনা তোমাকে', এই কথা বলে। তবে নৃশংসতার বর্ণনায় কেবল বাহ্যিক ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, এর গভীরে কবির মৃত্যু সম্পর্কে জীবনদর্শনও প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই পরিণতি কোন নিয়মনীতির বশ্যতা স্বীকার করে না। কবি এই কবিতায় শেষ স্তবকে লেখেন -

নৃশংসতা, তুমি কোনো চিকিৎসা জানো না?

জিহ্বামূলে বিঁধে আছে কাঁটা
বিবেক দংশন
উপড়ে নাও আলজিভ কিংবা কন্টকারি
মধ্যপন্থা আমি তো শিখিনি।

'পক্ষী', 'বাঘ' প্রভৃতি কবিতাগুলির নামকরণে মানবেতর প্রাণী থাকলেও আসলে মানব জীবনের সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন রূপকের আড়ালে। যেমন 'পক্ষী' কবিতায় দুটি স্তবকের প্রথম পংক্তিগুলি হল —

• পৃথিবীতে যত খাদ্য আছে, চাই তাঁর সুষম বন্টন

• সমস্ত প্রাণীরই চাই একটি করে নিজস্ব বসত

'বাঘ' কবিতাতেও প্রান্তিক মানবজীবনের জীবনচর্চার এক অস্পষ্ট আভাস ফুটে উঠে। রাজনীতির যে আগ্রাসী রূপ, আধিপত্যকামিতা ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে দেশকে, অধিকার করে নিচ্ছে সমাজকে,ধ্বংস করে দিচ্ছে মানবিক মূল্যবোধগুলিকে। এদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন কবি কয়েকটি কবিতার মধ্য দিয়ে। এই ধরনের অন্যতম একটি কবিতা 'বোঝাপড়ার খেলা'। 'জনতা ও জননেতার বোঝাপড়ার খেলা'ই এই কবিতার বিষয়বস্তু —

যারা দাপিয়ে বেড়ায়, তাদের মধ্যে
একটাই হুলো, জননেতা।
গায়ে সাদাকালো ছোপের জামা, যাকে বলে স্মার্ট।

কেবল জননেতা নয়, অস্থির সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোষামোদকারী মানুষের কপটতার মুখোশেও টান দিয়েছেন কবি। 'শান্তি পুরস্কার' কবিতায় 'বোকাসোকা' লোকেদের চালাক হওয়ার পথটুকুই দেখিয়েছেন। সুবিধাবাদের পথ বেয়ে তারাই অর্জন করেছে 'শান্তি পুরস্কার'। আর অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব ভীত আন্তর্জাতিক সংকটে —

আগুন-অস্ত্র জামাবার ঠাঁই নেই
যুদ্ধ না হোক, দমচাপা সন্ত্রাস
বাড়িয়ে তুলেছে উত্তেজনার পারা
যুদ্ধ-যুদ্ধ, খেলাও অবিশ্বাস।

কেবল বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন সমস্যা নয়, আমাদের নিকট সমাজের সমস্যার দিকেও আলোকপাত করেছেন কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে। কন্যাভ্রূণহত্যা থেকে শিল্পায়ন, বৃক্ষছেদন থেকে চিকিৎসার গাফিলতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকে জুয়াচুরি - সবই সমালোচিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' কবিতায় লিখেছেন —

ইশকুলে লাবড়ার ঘ্যাঁট — ছিল তাতে সাপের খোলস ?

প্রসন্নবাবুকে বলো, উনি খুব দয়া পরবশে।
এ রাজ্যে মেয়েরা মুক্ত, লবণহ্রদের কটা পাড়া ...
- আরও যে ঝকমকে পল্লি, তারা বুঝি এই রাজ্য ছাড়া?

কবি যশোধরা রায়চৌধুরি, বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন - ''বিজয়া মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন, তাঁর কাছে সমস্ত কবিতাই আসলে মানুষেরই কবিতা, একই সঙ্গে সেই কবিতার একেবারে ভেতরে থেকে যায়। হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে এমন এমন সব মেয়েমানুষের কথা, মানুষ হিসাবে অস্বীকৃত হয়ে অপমানিত বিক্ষুব্ধ মেয়ের মনের কথা, এমন সব সত্য হঠাৎ করে ভেসে ওঠে কবিতার মধ্যে যে আমরা স্তম্ভিত হই, পুষ্ট হই ঋদ্ধ হই।''

ঘোষিত নারীবাদী তিনি নন। অনুভাবী মন নিয়ে নারী জীবনের সীমাবদ্ধতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই ভাবনাকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন কবিতায়। মেয়েদের জোর করে আটকে রাখা হয় গণ্ডীবদ্ধ জীবনে। একেবারে প্রথম পর্বের কবিতা 'পুঁটিকে সাজে না' কবিতাটিতে নারী জীবনের সে ভাষ্য প্রকাশিত। দৃপ্ত কণ্ঠে কোনো প্রতিবাদ সেখানে নেই, শুধু বিষয়টুকু প্রকাশ করে গেছেন। সাধারণ রূপচর্চা, সংসার সেবা — এই মহৎ কাজই নারীজীবনের চরম সাধনা। সমাজের এই বক্তব্যকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। 'ঘর হতে' তার 'আঙিনা, বিদেশ' সমাজ তো মেয়েদের এমন শিক্ষাই দিয়ে আসছে -

তুই তোর ঘর গুছিয়ে নে
প্রদীপের সলতে পাকা
মনে রাখিস পুঁটি
এই তোকে ছেলে মানুষ করতে হবে
ধিঙ্গিপনা তোকে কি সাজে, ছি।

প্রতিবাদ সবসময় এতখানি মৃদু নয়। কোথাও কোথাও উচ্চকিত, কোথাও ব্যঙ্গ এমনই শানিত যে লিঙ্গরাজনীতির ওপর তীব্র কষাঘাত করে। এই ধরনের কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'পুরুষ'। পরাক্রমী পুরুষের ক্রোধ-উল্লাস-অভিমান-অবজ্ঞা- সবই সমাজের কাছে কাঙ্খিত। খ্যাতি সম্পন্ন পুরুষের কুৎসা মুহূর্তে ঢেকে যায়। পূজ্য হয়ে ওঠে তারাই। আর অন্যদিকে —

আঙুল ঘোরালে যারা ছুটে আসে
উচ্ছিষ্ট হতেই ভালোবাসে, ধর্ষণে কৃতকৃতার্থ হয় —
তারা জানে রমণী কামিণী নারী
অঙ্গনা বনিতা চিররমা।

বধু নির্যাতন, বধুহত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা - আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্র'এ মৃণালের জবানীতে লিখেছিলেন সে কথা। বিন্দুর মৃত্যুতে —

''দেশশুদ্ধ লোক চটে উঠল। বলতে লাগল, মেয়েদের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে মরা একটা ফ্যাশন

হয়েছে।... তোমরা বললে এ সমস্ত নাটক করা! তা হবে। কিন্তু নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির ওপর দিয়েই হয় কেন আর বাঙালি বীরপুরুষদের কোঁচার ওপর দিয়ে হয় না কেন, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত।"

সেটা ভেবে দেখেই কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের শ্মশানে শোয়ানো 'আপদমস্তক শাদা চাদরে ঢাকা' লাশকে মনে হয়েছে মহিলাই। 'লোকালয় থেকে বহুদূরে, একটি ঘর, একা মৃতদেহ' দেখে স্মরণে এসেছে 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনীকে, যাকে মরে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে সে মরেনি। ভয় আর শঙ্কার মাঝে থেকেও তাদের বার বার ভালো থাকার অভিনয় করে যেতে হয়। অথচ সেই মানবী প্রতিমাদের 'ভাসানের আগেই ভাসান' হয়ে যায়। ঘাটে ভেসে আসে ভাসানের নৌকা, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বিদায় নেয় সে—

কেন শুধু শুয়ে থাকে? — জিজ্ঞেস করেছে এক শিশু
কেউ তাকে সত্য জানাবে না,
কেন শুধু শুয়ে থাকে মাতৃনামে বীতবদ্ধ প্রমা
শুয়ে থাকে বাক্যহীন অশ্রুবিন্দু হয়ে
আমাদের সকলের ক্ষমা। (প্রতিমার মতো মুখ)

'নিতান্ত সাধারণ/প্রত্যয় গ্রামের মেয়ে' টুকাই গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে উন্নত প্রযুক্তির জগতে সে হয়েছে 'অসামান্য মহিলা'। পরিবারে সে এনে দিয়েছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। তার বাহ্যিক আচরণেও গর্ব ফুটে ওঠে, কিন্তু —

এখন শ্রেয়সী নামে জিনস পরে জিমে যায় টুকু
রাতের হোটেল-নাচে যৌন অভিনয় সারা করে
ক্লান্ত হয়ে ফেরে, অচেতন
দুঃখিনী টুকাই। (টুকাই)

শুধু টুকাই নয়, এই সর্বনাশের সুখের আশায় উনিশ-কুড়ি বছরের লক্ষ্মীও বস্তি থেকে 'গলফে' চলে যায়। উকুন ভরা মাথা আর ময়লা আঙুল চোষা মেয়েটির দেহে জৌলুস এলেও জীবন রয়ে যায় অন্ধকারেই।

'তাঁতবস্ত্র' কবিতায় মেয়েদের সংস্কারের নিগড়ে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে আছে প্রতিবাদ। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক বা উৎপাদন ক্ষেত্রে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ এই কবিতায় স্পষ্ট। 'তাঁতঘর' এখানে উৎপাদন ক্ষেত্রের রূপক —

শাড়ী পরে স্বামীগৃহে যাও মেয়ে, জানবে যা বুনট
জানলে ফাঁস হয়ে যাবে, — চক্ষুদান দেখবে না কন্যারা।
...
জানা অপরাধ তোর ও তির্যক ধানছাড়া, বিছা —

কলাচর্চা পুরুষের, উপার্জনও পুরুষের হাতে।

শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয়, শারীরিক শুচিতা হেতু দেখিয়েও মেয়েদের উৎপাদনশীল কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় —

তা ছাড়া, তুমি তো মেয়ে শুদ্ধ দেহ থাকো না সর্বদা
গৃহদেবতার মতো বস্ত্র, তাঁর পবিত্র বয়ন
টানাপোড়েনের গরমিলে তুমি এসো না কখনও সোনা মেয়ে।

সেই মেয়ে সংসারে গেল 'বুকে অপরাধ বয়ে'। বেসামাল সংসারকে অপটু হাতে সোনার সংসারে পরিণত করার আপ্রাণ করার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, নিজেকে সেই সংসারে বন্দিনী হিসাবে দেখতে দেখতেই 'অসম্ভব অহংকারী' হয়ে ওঠে। আবার কেউ একেই 'নির্বাসন' বলে মেনে নেয়। যেমন 'যোগ্যতার জন্য' কবিতার কথক মেয়েটি। 'ভুল' আর 'অহংকার'কে সরিয়ে, সোনালি রিবন, রেশমি ঝালর, মুক্তোর কাঁটা ফেলে নিরাভরণ বেশে যেতে চায় নির্বাসনে। 'এই পৃথিবীর যোগ্য ' এবং 'এই মহীয়ান জন্মের যোগ্য' হয়ে ওঠার জন্য নতশিরে অপেক্ষা করবে মেয়েটি। এই যাত্রায় কাঙ্খিত তার মায়ের আশীর্বাদ -

আমার মাথায় রাখো তোমার পাঁচ আঙুলের ছাপ
সিঁথিতে সমান্তরাল করো তোমার অক্ষয় তর্জনী।

'শুনতে শুনতে' কবিতাতেও আছে এমন এক মেয়ের কাহিনী, ছোট থেকে না শুনে যার বেড়ে ওঠা -

শুনতে শুনতে মেয়েটা কুঁকড়ে কালো হল
কুঁজো হল, মাথায় বাড়াল না।

শেষ পর্যন্ত লগ্ন মেনে সেও হয়ে উঠল পরিণীতা বধূ, জন্ম দিল আরেক কন্যার। মেয়েটি অন্ধ-বধির। এটির ব্যঞ্জনা দ্বর্থবোধক ভাবনা বহন করে। সাড়া জীবন সমস্ত নিয়মের বেড়াজাল মেনেও ভাগ্যের পরিহাসে তাকে জন্ম দিতে হয় এক প্রতিবন্ধী সন্তানের। আবার এই সংস্কারবদ্ধ সমাজে নারীর অবস্থান তো অন্ধ-বধিরের মতো। যুক্তিকে অস্বীকার করে যাকে নির্বিবাদে, নিঃশব্দে শাসনের গণ্ডিতে নিস্পেষিত হতে হয়। শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী মেয়ে নীপার কথা আছে 'প্রতিবন্ধী' কবিতায়। সেই 'হাবা তরুণী' নীপা - যার রাগ, ঈষা, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার মতো স্বাভাবিক বৈশিষ্টগুলো কারোর চোখে পড়ে না। প্রকট হয়ে ধরা দেয় কেবল খুঁত। তার মৃত্যু আকাঙ্খিত হলেও সহজে মনে না সেই মেয়ে। মুক্তি পায় না সংস্কারের বাঁধন থেকে -

ষোলো বছরের নীপার প্রত্যঙ্গ পুষ্ট হয়ে উঠতেই
ঠাকুরঘরে গোপালের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল তার।

প্রতিবন্ধী মেয়ে জন্মের এই পরিণতি। কিন্তু জন্মানোর আগেও তো শেষ হয়ে যায় কত প্রাণ।

'ছ-সপ্তাহের নষ্ট গর্ভ বউ' কাঁদলে তাকে ভর্ৎসনা করা হয় তীব্র ভাবে। 'বিজ্ঞাপন' কবিতায় কবি লেখেন -

ভ্রূণহত্যা ফিরবে বার বার
বার বার উন্মুখ তোকে
যেতে হবে দুর্গন্ধ ক্লিনিকে।

এই ভ্রূণহত্যার হিসাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'পরিসংখ্যান, ২০০২' কবিতায় -

একশ পুরুষে
মেয়ে তিরানব্বুই
সমস্যাগুলি
পাশে রেখে ফিরে শুই।

কবি পাশ ফিরে স্থির হয়ে শুতে পারেন না। তাই সেই সাতজন মেয়ের খোঁজ করতে বেরোন। খুঁড়তে থাকেন কবরের মাটি। সমাজপতিরা নির্দিষ্ট করে দেন এই অসাম্যের হেতু। অকল্যাণ বা কপালের দোষ দেখিয়ে পুরুষতান্ত্রিক ভিতকে আরও মজবুত করে দেয়।

কেবল প্রতিবাদ, শ্লেষ- ব্যঙ্গ বা নেতিবাচক বিষয়ের চর্চাই বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ঠ্য নয়। প্রতিবাদকে যেমন মরমী কলমের ছোঁয়ায় প্রকাশ করেছেন তেমনই স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি সঞ্জাত প্রেম রূপ পেয়েছে তাঁর কবিতায়। 'একটি ঘোষণা ও আমি' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ যদি শর্তহীন এর অন্তর্গত। কবিতায় প্রথম পংক্তিতেই কবি জানিয়ে দিলেন -

ভালোবাসার কোনো ভবিষ্যৎ নেই

এখানে যে ভালোবাসার পরিচয় দিলেন, তা স্থিতধী মনের পরিণত ভালোবাসা নয়। সেই ভালোবাসা নিয়তির মতো গ্রাস করে নেয় মন হৃদয় - সবকিছুকে। এমনকি এই নারকী প্রেম বিনাশের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই কবিতার শেষ স্তবকে গিয়ে কবি লেখেন -

ভালোবাসা, সর্বনাশ
আমাকে গ্রহণ করো
সহমরণের জন্য আমিও প্রস্তুত।

কৈশোরকালীন বা উদ্ভিন্ন তারুণ্যের যে প্রেম তাও ধরা আছে 'দুজন' এর মতো কবিতায়। অল্পবয়সে প্রেমের ছেলেমানুষি, লুকোচুরির সঙ্গে ভালোবাসা যে মানুষকে সহজেই নত করে তার ইঙ্গিত খুব সূক্ষভাবে কবি দেখালেন এখানে -

রানির মতো সেই মেয়েটি, তবু শখ
দুহাত ছুঁয়েছিল
মেজাজী ছেলেটির

পায়ের কালো নখ।

বিবাহপূর্ব এক নিবেদিত প্রেম এটি। বিবাহ পরবর্তীকালে দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে ঘটে প্রেম ও প্রেমহীনতার দ্বন্দ্ব। যেমন 'মধুবিষে ভরা' কবিতায় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ও তার মাঝে সন্তানের অবস্থান, - এই বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপিত -

মধু বিষে ভরা ও দাম্পত্য।
সন্তান, তুমি অধিকার-ভ্রমে গণ্ডি পেরিয়ে
এদিকে এসো না।

দাম্পত্য সম্পর্কের অলি-গলি সন্তানের অনুধাবনের বিষয় নয়। তবু সেই গণ্ডি পেরিয়ে সন্তানের উঁকি দিতে ইচ্ছা করে। সেখানেই কুণ্ঠিত দম্পতি -

দম্পতি যেন হঠাৎ পাথর। সন্তান, তার
বুক ভেসে যায় উথাল পাথাল
বাইরে পাথর, ভেতরে কি মধু, ভেতরে কি বিষ?

প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে প্রেমে আর স্নিগ্ধতা থাকে না। সারাক্ষণের সঙ্গী তখন কেবল মনে জাগিয়ে তোলে উদ্বেগ, এরই সঙ্গে নিত্য বসবাস। আর অন্য দিকে -

প্রেম অতিথির মতো
কখনও ঢুকে পড়ে অল্প হেসে,
সমস্ত বাড়িতে স্মৃতিচিহ্ন ফেলে রেখে
হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। (সঙ্গী)

২০০২এ প্রকাশিত *সামনে আপনারা* কাব্যগ্রন্থে বিজয়া মুখোপাধ্যায় এনেছিলেন মিলি নামের চরিত্র। অবশ্য চরিত্র না বলে সম্বোধন বলাই শ্রেয়। মিলিকে সম্বোধন করে কবি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছেন। 'মিলির সঙ্গে সংলাপ' কবিতায় তিনটি অংশ আছে। তিনটি অংশ জুড়েই প্রকৃতির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার জন্য কবিমন উন্মুখ হয়ে আছে। কখনও গভীর দার্শনিক ভাবনার ছোঁয়াও লাগে সেখানে। এই কবিতাগুলি কেবল গদ্যছন্দেই লেখা হয়েছে এমন নয়, সম্পূর্ণ গদ্যের আঙ্গিককেও ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির দীর্ঘ বর্ণনার পাশাপাশি শোনা যায় নিঃসঙ্গতার সুর। শব্দচয়ন ও বাক্য নির্মাণও সাধারণ গদ্যের মতো। তবে মিলিকে সম্বোধন করে রচিত 'যাঁরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যান', 'গড়িয়াহাট রোড, ১৯৯৯', 'রাত্রির ডায়রি' বা চৈত্রবনের গন্ধ' কবিতাগুলি সাধারণ কবিতায় আঙ্গিকেই রচিত। কখনও মিলি কবির কাছে যন্ত্রণার উপশম—

আপ্রাণ লড়াই করছি। তুমি বুঝতে পারো?
ফালাফালা করে ফেলছে নষ্ট পরিবেশ
টলে যাচ্ছে মাথা, শিরদাঁড়া, উপড়ে যাচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা, ঘুঁটি।

'চৈত্রবনের গন্ধ' কবিতায় প্রকৃতি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। মধ্যচৈত্রে অর্থাৎ গ্রীষ্মের দুপুরে গ্রামে গিয়ে সেখানকার রূপ-রস-গন্ধ অন্তরে ধারণ করেছেন। হাতে নিয়ে ফিরেছেন 'গ্রীষ্মফুল'। রাতে সেই ফুল কলমদানি থেকে 'পাগলকরা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে'। নগরজীবনের কাঠিন্য কবির মনে জাগিয়েছেন বেদনা। শহরের 'রাস্তার ধারে ফুটপাত ঘেঁষে কাঁচা জমি নেই'। বিশ্বায়ণ এসে শহরের বাড়ি ভেঙে তৈরী করেছে সৌধ মাল্টিস্টোরেজ বিল্ডিং বা শপিং মল। বিমপেটা আওয়াজে ঢেকে গেছে 'মানুষের স্নায়ু, মগজ, চোখ, নাক'। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়েও —

তবু আজ এই ভবিতব্য ভুলে, এ মুহূর্তে মিলি, তোমাকে
পাঠাতে চাই একমুঠো সুগন্ধ বাতাস।

নাগরিক সভ্যতার এই আগ্রাসী মনোভাব কবিকে বার বার আতঙ্কিত করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণের নামে যে কপটতা চালিয়ে যায় শিক্ষিত শহুরে সমাজ কবি ধিক্কার জানান তাকে। প্রতিবাদ করেন তীব্র কণ্ঠে - একের পর এক গাছ কাটা হয় যেখানে রাস্তা চওড়া করার নামে। শহর জুড়ে হবে ফ্লাইওভার। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপন উৎসবে লাগানো গাছ 'কিছু মরবে, কিছু লুটোবে ধূলোয়'। এই ইঁট-কাঠ-কংক্রিটের মাঝে বেড়ে ওঠা শৈশব নিয়ে কবি চিন্তিত -

বিভ্রান্ত বালকের চোখে এখন শুধু প্লাস্টিক পর্দা, ইলেকট্রিক কারিগরি -
জল নেই, স্বপ্ন নেই, শুধু ফোটোগ্রাফ।

এই নিয়ে তথাকথিত শিক্ষিতমহলে চলে ফলহীন কিছু দীর্ঘ আলোচনা -

বুদ্ধিজীবিতের দল শুধু ফন্দি আঁটে
সেমিনার শুধু দীর্ঘ হয়। ('গড়িয়াহাট রোড, ১৯৯৯)

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সংকটের মাঝেও কবি স্বপ্ন দেখতে চান মিলিকে -

রাতে ঘুম আসে না, ভোরে ঘুমোই একটু - তোমাকে তো স্বপ্ন দেখতে দেখতে হবে।
দেখতে হবে কপালের ব্রণ আর মস্ত নাকের নীচে একসমুদ্র হাসি। (আরও মিলি)

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বলোককে গ্রাস করে নিয়েছে। স্বদেশ-বিদেশের দূরত্ব গেছে ঘুচে। অন্তর্জালে আহ্বান আর মানুষের মৌখিক বা হার্দিকভাবে স্বাগত জানানোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে - এই বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে কবির 'অন্তর্জাল ও পিপড়ে' কবিতাতে। সেই অন্তর্জাল পৃথিবীর আবহাওয়ার সংবাদ দেয়, কিন্তু 'সাগরের দিকে থাকে যে সব মাঝিবউ' তাদের কাছে সেই সাবধানবাণী পৌঁছয় না সব সময়। তাই কবি বিশ্বাস করতে বলেন ওই উদ্বাস্তু পিপড়ে সারিকে। 'টুলির জন্য' কবিতাতে প্রযুক্তি কীভাবে শিশুমনকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে তার ছবি ধরা পড়েছে। মোবাইল, ডিটিপি মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে কবিতার কথা, কবিতার ক্লাস, ছন্দের বারান্দা বা বাংলা ছন্দ পরিক্রমা'র মতো বইয়ের কাছ থেকে। অনেক সুবিধা এই টেকনোলজির জগতে। কিন্তু 'ঘাসে রক্তপাতে/অসম্মানে উদাসীন ফুটেছে অক্ষর' - সেই যাত্রার সঙ্গী হতে

পারেনি প্রযুক্তি নির্ভর মানুষ। বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য ও বিনোদনের প্রদর্শনকামিতা গ্রাস করে নিয়েছে শিল্প, সাহিত্য — সব কিছুকে।

এই যান্ত্রিক জীবনই কবিকে বার বার টেনে নিয়ে গেছে প্রকৃতির কাছে। কবি হারিয়ে ফেলেছেন শুদ্ধতার ভাষা। প্রকৃতির অনুসঙ্গে কবি মানবসমাজের মূল্যবোধ্যহীনতার দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন -

আজকের ভোর মলিন, আজকের সন্ধ্যা
ধোঁয়াটে। দেখা যায় না জলে প্রতিচ্ছবি, সকালের সূর্য
আর সন্ধ্যার তারামন্ডল। (চাওয়া)

বিভ্রান্ত মানব সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবির কাতর অনুনয় —

মরতে মরতে বলে যেতে চাই,
বন্ধ হোক লজ্জা রক্তপাত,
আবন্ধ, অব্যর্থ হোক মানবজীবন। (চাওয়া)

'ঐশ্বরিক' কবিতাও কবি চেয়েছিলেন 'ক্রন্দনহন্তারক' পুত্র। তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে। কিন্তু সেই দৃঢ় অঙ্গিকার রাখতে ঈশ্বরও অক্ষম —

ঈশ্বর প্রথমে হাসলেন,
তারপর তাঁর নিরুপায় চোখ থেকে
বিশাল অশ্রু ঝরে পড়ল।

তবুও 'আয়ুষ্মতী পুত্রবতী' মায়ের স্বপ্ন নেভে না। 'তেলচিটে লাথি' সহ্য করে মা শুয়ে থাকে ফুটপাতে —

ওর ছেলে কী করে, কজন,
অয়াগন ব্রেকার কিংবা বেশ্যার দালাল
কিংবা খঞ্জ অথবা ভিখারি।
(আয়ুষ্মতী পুত্রবতী)

কিন্তু বাঁচার ইচ্ছে বড় ভয়ংকর, তাই সমস্ত প্রত্যাখ্যানকে অস্বীকার করে তাকিয়ে থাকে জীবনের দিকে। 'ধুলোর কার্পেট ছিঁড়ে' কবিতাও আছে তেমনই এক না-বালিকার কথা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা যে মেয়েটির হাতের মধ্যে থেকে ফসকে গেছে শৈশব। সেও অপেক্ষা করে সেই জাদুকরের, যে —

কোনদিন এসে, হেসে
ফিরোজা আলোর নীচে, খেলাচ্ছলে
দিয়ে যাবে চাবি ....

শুধু তাই নয় ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকা হয়ে যায় তার চোখে, উচ্চাকাঙ্খী মেঘ এসে অবসান ঘটাবে

তাদের অপাংক্তেয় জীবনের।

'রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা' — তাঁর প্রথম কাব্যের অন্তর্গত কবিতা। সেখানে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের স্তুতি উচ্চারিত হয়নি। যে গভীর জীবনদর্শন, যে ইতিবাচক মনোভঙ্গি অন্ধকারের মাঝেও মানুষকে আলোকমুখী করে তোলে তারই নিদর্শন এ কবিতা। শেষ জীবন পর্যন্ত বিশ্বাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর আস্থা তা এখানে দ্যোতিত। শেষেও যে শুরুর ঈঙ্গিত ধ্বনিত হয়, 'প্রত্যয়ী অঙ্কুর' জেগে ওঠে সেখানেই—

এমনকী অন্তিমেও
জন্ম তার অনায়াসে ধন্য হতে পারে
দিব্য করুণার মত স্নেহে - অলৌকিক।

'এখন রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটির দুটি অংশ - 'তার জলরং' এবং 'তাঁর গান'। প্রথম অংশে প্রকৃতির অনুসঙ্গ কীভাবে তাঁর 'ম্যাজিক জলরং' এ প্রকাশ পেয়েছে সেই চিত্রকল্প কবি নির্মাণ করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রনাথের গান মানবমনের কোন গভীরে স্পর্শ করে সেই অনুভুতিই ব্যক্ত হয়েছে—

তোমার সর্বস্ব কাড়তে এসে ফিরে গেছে
সুর। তাই রেখে গেছে ঊন-কাঁটা শরীরের তাপে।

'স্মরণ জীবনানন্দ দাশ' কবিতায় জীবনানন্দকেই ঈশ্বর ভেবেছেন বলে জানিয়েছেন কবি। তবুও তাঁর জটিল জগতের 'জাতিদ্বেষ' নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কবি —

চতুর্বর্ণা নারীদের কী এত দরকার ছিল প্রতিবাদে।

আবার সংকটকালে তিনিই কবির ত্রাতা। 'বিপুল চিৎকারকালে' হয়ে ওঠেন কবির কঠিন ঈশ্বর। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা কবিতাটি অনেক আগে রচিত হলেও সন্দীপনের মৃত্যুর পর তা প্রকাশ পায়। শিল্পীর বিনয়ের সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর পোশাকের মালিন্য, যা 'নীরবে আবৃত করে পরিচ্ছন্নতাকে'। সেই ধুলোবালি প্রহরীর পরোয়া করে না। এভাবেই কবিতা লিখেছেন তারাপদ রায়, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখকে নিয়েও। বিতর্কিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে রচিত 'তাঁর মৃত্যু' কবিতায় লেখেন—

ব্রাত্য তাঁকে করেছে যে গান
সেই থাক। ধূপ চন্দনের বহুলতা
তারবৃত্তে নামাঙ্কিত ফুল
মিথ্যাভাষণের মালা
মানায় না তাকে।

দেশভাগ জনিত বেদনা, স্মৃতিমেদুরতা বার বার ফিরে এসেছে বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়। কবি কোনো রাজনৈতিক সীমারেখায় বন্দী নন। পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ ভিন্ন দেশে

পরিণত হলেও তার গাছপালা-প্রকৃতি তাঁর কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে। 'দুঃখী কালো মেয়ে' কবিতাটি লেখা পূর্ববঙ্গের কোনো কালীমন্দিরের অনুষঙ্গে। কবি ধর্মের ভাষ্য রচনা করেননি এ কবিতায়। নারীত্বের চিরন্তন যন্ত্রণার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন দেশমাতৃকার বিভাজন যন্ত্রণাকে —

তোমাকে জড়িয়ে ধরে ভাগ করে নেব কষ্টহিম
চোখে জল মুছে বলব, ছি!
আসলে তুমিও এক পরিত্যক্ত দুঃখী কালো মেয়ে,
এপারের দিকে চেয়ে আছ।

আটত্রিশ বছর পর জন্মভূমিতে পৌঁছে সব অচেনা লেগেছে কবির। 'একুশে ফেব্রুয়ারি, তিরানব্বুই' কবিতায় সেই অনুভুতি প্রকাশ পেয়েছে —

রাস্তা হারিয়ে দেয় শহর, এলিফ্যান্ট রোডের সরু গলি।
দুপাশে আছে এসব কী - সোনার গাঁ প্যালেস,
পলাশবাড়ি, মহানগর প্রভাতী।

শুধু তাই নয়, দেশভাগ জনিত তাৎক্ষণিক অভিঘাতও ধরা আছে তাঁর একেবারে প্রথম পর্বের কবিতায় —

একদিন রাতে
পদ্মানদী চুরি হয়ে গেল।
তার সঙ্গে
গোয়ালন্দ ঢাকা মেল
তারপাশা খাল নৌকো
বিকেল বিকেল বাড়ি -
সব চুরি হয়ে গেল।
(হিমঘরের মাছ)

প্রকৃতির অনুষঙ্গে নানা চিত্রকল্পের সুনিপুন ব্যবহারে বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী। 'নামাবলী উড়ে যাচ্ছে ঝড়ে' কবিতায় বাঘের ডোরাকাটা দেহের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন নামাবলীকে। 'ফিলম' কবিতাতে নাগরিক নিম্নবিত্ত সমাজের চিত্রকল্প অঙ্কিত। 'ঐতিহ্যের আলকা পলকা' কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির যে ছবি এঁকেছেন , খুব সাধারণ হয়েও কবিতায় তা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে —

মন্দিরের পেছনে ছাইগাদা, ফাটলে অশ্বত্থ শিশু
রঙিন ছাতার মতো নয়নতারা আর
শাদা ভেলভেট দোলনচাঁপা
এখন অভিবাদন করে সূর্যাস্তকে

বাংলা ভাষার প্রতি গভীর অনুভব প্রকাশ পেয়েছে 'বাংলা ভাষা' কবিতায়। সেই ভাষার অবক্ষয় নিয়ে বেদনাতুর হয়েছেন কবি —

কিন্তু হঠাৎ বর্ণমালা
ডিটিপি ছাড়িয়ে কেন যে দাঁড়াও
আঙুল শরীরে ভুল ইংরিজি, শস্তা হিন্দি দাগড়া দাগড়া।

এই কবিতার অনেক আগে লেখা 'ফিলম' কবিতাতেও সংবাদপত্রের শব্দ ব্যবহার নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন —

আজকেই কাগজে লিখেছে 'সখ্যতা' ও 'প্রসারতা' শব্দ দুটো -
আমি আর কেয়ার করি না।

প্রকৃত কবির দায়িত্ব নিয়েই সারাজীবন কাব্যসাধনা করে চলেছেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁর কাব্যচর্চা যেমন সমৃদ্ধ করেছে বাংলা কবিতাকে, তেমনই কবিতার বিচিত্র গতিপথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাঁর কবিতার পরতে পরতে আছে 'সহজ-লাবণ্যময় -প্রসাধিত' এক অনন্য রূপ। আজও তাই সেই প্রিয় কবির কাছে তাঁর পাঠককূল আশা রাখেন 'আরেক মুঠো অথৈ আকাশ' এর।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ ঃ

১) বিজয়া মুখোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) সন্দীপ দত্ত, বাংলা কবিতার কালপঞ্জি (১৯২৭-১৯৮৯), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩।

২) সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েলি পাঠ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।

৩) সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা ঃ

১) অনন্দা, নারীর কলমে কবিতা সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২০।

২) বনানী, ছয় কবি সংখ্যা, ২০১৪।